মাঝের দুজন

মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়

একজনকে দেখে আমার পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর নেশা লেগে গিয়েছিল এমন কথা মুখে আমি স্বীকার করলেও কাজের বেলা কিন্তু তা নয়। পাহাড়ে আমাকে আসতে হয় কাজে, নেশার কাজে। অনেককে বলতে শুনেছি পাহাড়ের নেশা খুব খারাপ নেশা, মদ মেয়েমানুষের চেয়েও খারাপ। যাকে ধরেছে সে বুঝতে পারে না, অন্যেরা বোঝে। সব নেশাই তাই, যাকে ধরেছে সে ছাড়া আর সবাই দেখতে পায়। নেশাড়ু নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। জানবে কি করে? তবে নেশা আমাকে ধরিয়ে দিয়েছেন যিনি তিনি নিজেও জানেন না কি অন্যায় তিনি করলেন। একজনের যে সর্বনাশ করে ছাড়লেন, সেটা তাঁর অজানা রয়ে গেল। সেই উনসত্তর বছর বয়সের মহিলা, যিনি দমদমে থাকেন, নাম শ্রীমতি অপরাজিতা কয়াল, তিনি আমাকে নেশা ধরাতে মাত্র মিনিট কুড়ি সময় নিয়েছিলেন। কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমার সর্বনাশটি করে চলে গিয়েছিলেন নিজের পথে। তাঁর সঙ্গে ছিল একটি সতের বছর বয়সের পাহাড়ি বালক, তার পিঠে শ্রীমতি অপরাজিতার মালপত্র। ওঁরা নামছিলেন, আমরা উঠছিলাম। জায়গাটা উত্তরকাশী। আমরা যাব হর কি দুন, উনি সেটা সেরে আসছেন। ওই গ্লেসিয়ার ঋগ্বেদে উল্লিখিত সরস্বতী নদীর উৎস ছিল। শাঁখা সিঁদুর, পায়ে বাটা নর্থ স্টার, চোখে চশমা, প্যান্ট শার্ট, মাথায় টুপি আর ফুলস্লিভ সোয়েটার পরা অপরাজিতা দিদি আমায় বলেছিলেন—

—বছরে একবার পাহাড়ে না এলে মনে হয় কিছু অপূর্ণ রয়ে গেল। একটা বছর কিছুই করলাম না।

রিটায়ার করার পর থেকে এই হল তাঁর হবি। বেড়ানো কিংবা পুজো, স্বাস্থ্যচর্চা কিংবা মনের খোরাক, যাই বল, এটা তাঁর চাইই-চাই। ওই পূজার কথাটা আমাকে যেন বিদ্ধ করেছিল। উনি বলেছিলেন।

—আমার স্বামী মিস্টার প্রদীপ কুমার কয়াল একদম কষ্ট করতে চান না। তিনি অবশ্য আমার পাহাড়ে ঘোরার জন্যে কিছু বলেন না। আর বললেই বা শুনছে কে? অতএব আমি আসি, প্রতি বছর আসি। সারাজীবন ভাই চাকরি করলাম, মেয়েদুটোকে মানুষ করলাম, বিয়ে দিলাম। এখন আমি ফ্রি। এখন যদি বের না হব আর কবে হব? এখনো হাত পা চলছে। পরে হয়ত আর পারব না। কলকাতা থেকে বছরে একবার বেরিয়ে পড়ি, মুক্ত বিহঙ্গের মত লাগে। কত ভাল লাগে বল? মনে হয় আরো একটা বছর বেঁচে থাকার রসদ নিয়ে গেলাম বুক ভরে।

উনসত্তর বছর বয়সে কম নয়। উনসত্তর বছরে অনেকে লাঠি নিয়ে রাস্তা চলা অভ্যাস করে ফেলেন। আমার নেশাড়ু দিদি দিব্বি টানটান হয়ে নামছেন উত্তরকাশীর পাথর থেকে পাথরে। দুপুরের খাবার খেতে আমরা একটা জায়গায় বসেছিলাম। উনি আগেই এসে বসেছেন ঝর্ণাটার পাশে, বসেছেন আমাদের থেকে একটু দূরে। তখনি নজরে পড়েছিল শাঁখার অস্তিত্ব। আমি এগিয়ে গিয়ে যেচে আলাপ করেছিলাম। এখান থেকে নেটওয়ার গ্রামটা প্রায় পাঁচ কিলোমিটার নিচে। নামতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। পাহাড়ে সন্ধ্যে নামে ঝুপ করে, সহসা। আর বৃষ্টি নামে যখন তখন। একটি বালক আর একটি বৃদ্ধার জন্যে ভাবনা হচ্ছিল আমার। একা একা নামছে ওরা দুজন, আর নামার সময়েই যত দুর্ঘটনা ঘটে। সাবধানে একপা একপা করে নামতে হয়। হাঁটু মচকে যবার সম্ভাবনা প্রবল। দি তেমন কিছু হয়, কে নামিয়ে আনবে তাঁকে?

তেমন হলে হবে, এই যদি মনের গঠন না হয় তাহলে পাহাড়ে আসা কেন? অপরাজিতা দিদিকে যতদূর দেখা যায় আমি দেখলাম তারপরে একটি নিঃশ্বাস ফেলে ওঠা শুরু করলাম। তখনো আমি জানি না আমার কি সর্বনাশটাই না তিনি করে গেলেন। নিজের নেশাটি ছোঁয়াচে রোগের মত পরমানন্দে আমার ওপর সংক্রামিত করে নেমে গেলেন নেটওয়ার গ্রামে। তারপর থেকে আমি আসি পাহাড়ে, নিয়মিত, প্রতি বছরে তিনবার। না এলে মনে হয় একটা কর্তব্য করা থেকে আমি বিরত হচ্ছি।

আমার ধর্ম হল গরমের সময় একবার পাহাড়ে আসা, দিন পনেরর জন্যে। এসে ঘুরে যাওয়া, কিছু ওঠা, কিছু নামা অভ্যাস করা। গরম পেরিয়ে বর্ষার সময় আর একবার আসতে হয়। শীতকালে আসি না। তখন বরফ থাকে চারিদিকে। বরফ গলার সময় আর একবার আসি। কখনো হিমাচল, কখনো উত্তরাঞ্চল, কখনো নেপাল কিংবা সিকিম হিমালয়ে আমাকে যেতেই হয়। আমিও সব সময় যে তিন চারজনের দল পাব এমন আশা করি না, তবে পেয়ে যাই, বিদেশী কিংবা স্বদেশী। তিনবার তিনদিকের পাহাড়ে ঘুরি। তেমনি করেই একবার একজনকে পেয়েছিলাম, সে আমার নেশা ছাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তাকে দেখে। সেও মহিলা, মহিলা না বলে তাকে মেয়ে বলাই সঙ্গত। মেয়েটি অল্পবয়েসিই শুধু নয় বেশ সুন্দর বলা যেতে পারে। তারও নাকি একা একা পাহাড়ে ঘোরার শখ। কিন্তু অপরাজিতা দিদির কথা বোঝা যায়, তিনি প্রবীণ, আর এই সুন্দর অল্পবয়েসি মেয়েটি ছিল অন্তঃসত্ত্বা। একটি যুবতী পেটে বাচ্চা নিয়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এতটা আমার সহ্য হল না। এবারও আমি যেচে আলাপ করলাম এগিয়ে গিয়ে

—আপ একেলি আয়ি হ্যায় য়হাঁ, পাহাড় মেঁ?

—জী হাঁ। কিঁউ, মুস্কিস ক্যা হ্যায়?

কি করে বোঝাই, মস্কিলটা কোথায়? ওনার মুস্কিল না হলে আমার বাবার কি? রাখ গ্রাম থেকে আমরা

চলেছি পরের গ্রাম তুর। সেটা এখনো তিন কিলোমিটার হবে। রাস্তায় তাঁকে পেলাম, এক পাহাড়ি গ্রামের ভুট্টাখেতের পাশে বসে বিশ্রাম করছেন, সঙ্গে একটি বছর পনের ষোলর বালক, যার পিঠে ওনার বোঝা। উনি বললেন

—আপলোগ কাঁহা তক ট্রেক করেঙ্গে?

—মিনকিয়ানি গ্লেসিয়ার। মেরা নাম মান সিং ধিঙ্ডা, মে আই নো ইওর নেম প্লীজ।

—বাঙালি নন? আমিতো ভেবেছিলাম বাঙালি। আপনার হিন্দিটা একদম বাঙালিদের মত। একা না দলের সঙ্গে এসেছেন?

—একা বলতে পারে। দল অবশ্য একটা পেয়ে গেছি।

—কবে ফিরবেন? ওহো, বলতে ভুলেগেছি, আমার নাম মঞ্জরী, মঞ্জরী বসাক।

—ফিরতে চার পাঁচ দিন লাগবে। কমও লাগতে পারে। ডিপেন্ডস।

—চম্বাতে আমি থাকব হোটেল রাভি ভিউ তে, বাস স্ট্যান্ডের একদম কাছে। এলে দেখা করবেন। আমার নামতে দুদিন লাগবে আরো, বুঝতেই পারছেন কেন? হোটেলে অপেক্ষা করব। চম্বাতে তিনটে দিন থাকার ইচ্ছে আছে। আসুন না আপনি, গল্প করব, ঘুরব ফিরব। আপনার তাড়া নেইতো?

তাড়া আমার নেই আবার আছেও। সবারই সময় হিসেব করা থাকে। তার মধ্যেই সব কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তা ছাড়া একটি অন্তঃসত্ত্বা মহিলা, যিনি আমার স্ত্রী নন, আমি তাঁর সঙ্গে চম্বাতে ঘুরছি ফিরছি, এই দৃশ্যটা আমাকে বিচলিত করল। বললাম

—তাড়া আমার আছে আবার নেইও। একটা সময় স্থির করে এসেছি, তার মধ্যেই কাজ সেরে ফিরতে পারলেই হল।

—বাড়িতে কে কে আছেন? কোথায় থাকেন?

—দিল্লিতে থাকি, আর আপনি যা ভাবছেন তা নয়, বিয়ে করিনি, বাবা মা লুধিয়ানা জেলায় গ্রামে থাকেন।

মেয়েদের এই এক দোষ। হাঁড়ির খবর চাই। বাড়িতে কে কে আছেন, বিয়ে হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে কটি বাচ্চা। তারপর বলবে বউ-এর নাম কি? কোথাকার মেয়ে? আমিও তেমনি। পরমানন্দে উত্তর দিয়ে যাচ্ছি ভুলভাল। আমি দিল্লিতে থাকি না, কানপুরে থাকি। আমার নাম চিত্তরঞ্জন প্রামাণিক, জেলা নদিয়া। বাবা আছেন, মা আছেন, দাদা বৌদি আছেন। এত কথার কি দরকার? বিশেষত আমার কাজের ধরন এমনই যে বেশি কথা বলা মানা। আমি অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ করি এবং আমাদের বলা আছে কারো সঙ্গে বেশি মাখামাখি করবে না। তাতে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। যত কম চেনে লোকে তত ভাল। অতএব আমি মান সিং ধিন্ডা, অনাথ ছিলাম একদিন, লুধিয়ানা জেলার লোক। বললাম—

—আচ্ছা, চলি।

—আসুন। চম্বায় আবার দেখা হবে।

আমি জানি এই কয়েকদিন পরেই চম্বায় মিঞ্জর মেলা বসবে। এখন থেকেই লোক সমাগম শুরু হয়েছে। পাহাড় থেকে গদ্দিরা নেমে আসবে তাদের নিজস্ব পোষাক পরে। পাঙ্গিরাও আসবে নানা রঙের পোষাক পরে। সেই সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য হবে। আমার আসার আসল উদ্দেশ্য সেই মেলায় বাণিজ্য করা। আমার বাণিজ্য খুব খারাপ বাণিজ্য, পুলিশে ধরলে হাজতবাস, তারপর জেল। অবশ্য সঙ্গে কোন মাল না থাকলেও ধরে পুরে দিতে পারে ওরা। তাতেও হাজত এবং জেল। কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন— তাহলে অমন কাজ করেন কেন ভাই। উত্তরে আমি বলব— যাদের আর কিছু করার নেই তাদের একটা কিছু তো করতে হবে। খাওয়া পরা বাসস্থান, বাবা মা ভাইবোন সবাইকে দেখতে গেলে অব্যর্থভাবে যেটির প্রয়োজন সেটির নাম টাকা। আমি যখন বিএ পাশ করে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছি তখন আমাকে কেউ ডেকে কাজ দেয়নি, চাইলেও কাজ দেয়নি। বলেছে কাজের অভিজ্ঞতা কী আছে বল? কাজ করব তবে তো অভিজ্ঞতা হবে? তখন একজন আমাকে ডেকে কাজ দিয়েছিল, বলেছিল—

—আজ থেকে তোমার নাম মান সিং ধিন্ডা। তুমি অনাথ বাচ্চা ছিলে, বড় করেছেন একজন পাঞ্জাবি সর্দার। তিনি মারা গেছেন। কানপুরের অফিসে তোমার পোস্টিং করব। কাজটা কিন্তু রিস্কি। আজ থেকে ডান হাতে একটা লোহার কড়া পড়ে থাকবে আর পাঞ্জাবি ভাষা বলা শিখবে।

অর্থাৎ আমার ইহকাল গেল পরকালও গেল। বাবা মা এবং জন্মস্থানকে পুরো অস্বীকার করে কাজে নামলাম। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরি, বছরে তিনবার। তাহলেই লাঘ দেড়েক টাকা পেয়ে যাই, চাইলে বেশিও পেতে পারি। বেশ কিছু টাকা জমা আছে আমার। মালিক আমায় খুব ভালবাসেন। আমার আসল নামে কানপুরেই একটা জমি কিনেছেন বাড়ি করার জন্যে। আমি মানল কেনাকাটার কাজ করি। পাহাড় থেকে সস্তায় মাল কিনে এনে মালিককে জমা দিই। মাসে মাসে মাইনে পাই, একবারে ঠিক সময়ে মাসের শেষ দিনে চেক পেয়ে যাই হাতে, পুরো অফিসের কায়দায়। আমার অফিস কানপুরে মহাত্মা গান্ধী রোড আর কেমব্রিজ রোডের মোড়ের কাছে একটা ভাল অফিস পাড়ায়। আমি পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসি, লেখাপড়া করতে ভালোবাসি। একটা প্রাইভেট এমবিএ কলেজে ভর্তি হয়েছি মান সিং নামের জাল ডিগ্রি দেখিয়ে। মালিক বলেছেন, পাশ করতে পারলে মাইনে ডবল হয়ে যাবে। আমি এখন সুখী মানুষ। ধরা পড়ার ভয় নেই আমার, কেননা ধরা পড়ার আর না পড়ার মধ্যে পার্থক্য খুব কম।

ইচ্ছে করলে পুলিশ আমাকে বেমালুম ধরতে পারে কলেজের ক্লাস রুম থেকেও। নিজেদের মাল দেখিয়ে পঞ্চনামা করতে কতক্ষণ লাগে ওদের? আমি কাজ করি, মালিক আমাকে প্রোটেক্শন দেন। তবে বলতে হবে আমার কাজটা হোয়াইট কলার জব। খারাপ ভাষায় যাকে বলে চরেস, তাকেই ভাল ভাষায় বলে ডোপ, সেটা আমি পাহাড় থেকে কিনে এনে জমা দিই। এই আমার কাজ, আর তার জন্যেই আমি মাইনে পাই। তার জন্যেই আমি এমবিএ পড়তে পারি। আর তার জনেওই আমার চম্বার মিঞ্জর মেলায় আসা।

অতএব পাহাড়ে কোথায় কোথায় গাঁজার গাছ জন্মায় সেই খরবটা আমাকে জানতে হয়। গ্রামের লোক যারা গাঁজার পাতা চটকে রস বার করে তার থেকে সবুজ মটর শুঁটির মত গুলি পাকিয়ে শুকিয়ে রাখে ঘরে ঘরে, সেই গ্রামগুলোর কথা জেনে রাখতে হয়। গাঁজার কুঁড়ি অত্যন্ত দামি জিনিস। শুকনো গাঁজা গাছের কুঁড়ি থেকে তিনশ রকম ওষুধ পাওয়া যায়। তার মধ্যে এক আধটা অতি দুর্মুল্য। বছরের কোন্ সময়টা খুব সুবিধের সময়, পুলিশের গুপ্তচরেরা থাকে না আশে পাশে, সেটা জেনে নিতে হয়। তারপর এমন করে মাল নিয়ে নামতে হয় পাহাড় থেকে, যেন আমি একজন স্টুডেন্ট, শৌখিন পর্বতারোহী, টায়ার্ড হয়ে নামছি দলের সঙ্গে। আমার পিঠটুতে মাত্র দু কিলো চরস আছে প্লাস্টিকের মধ্যে সিল করা যার ওপর এমন কড়া ফিনাইলের গন্ধমাখা কাপড় লাগিয়ে দিয়েছি যে কুকুরের বাবার সাধ্য নেই শুঁকে বলে এর মধ্যে চরস আছে। এবং আমার কাছে আমার কলেজের আই কার্ড আছে যা থেকে আমার নাম ধাম প্রমাণ করা খুব সোজা।

গাঁজা গাছের পাতা হাতের তালুতে চটকে রস বার করে রস সুদ্ধ আঠা শুকিয়ে নিয়ে ভোঁতা ছুরি দিয়ে চেঁছে নিলেই মটরশুঁটির মত চরস পাওয়া যায়। গাঁজার কলকেয় একটা গুলি বসিয়ে তাতে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ধরে টানলেই চিত্তির। সাধারণ মানুষ পুরো একটা দিন উঠতে পারবে না। অবশ্য চরসের গুলিকে গুঁড়ো করে অন্য জিনিস মিশিয়ে নিলে তার মাদকতা শক্তি কমিয়ে দেওয়া যায়। তার আবার কত কত আদরের নাম, ডোপ, পাফ, হার্ব, পট, উইড, গ্রাস। আসল নাম ক্যানাবিস, ক্যানাবিস ইন্ডিকা। দুহাজার বছরের আগেও এর ব্যবহার জানত চিনেরা। সেসব তাদের বইতে লিখে রেখে গেছে।

এত কথা বলার দরকার ছিল না। কিন্তু আমার পরিচয় না দিলে বুঝতে ভুল হবে আমার কথাবার্তা, চাল চলন। যদিও আমি মান সিং ধিন্ডা নই আমার নাম চিত্তরঞ্জন প্রামাণিক, বাড়ি নদিয়া জেলার গ্রামে, তবু কাজের খাতিরে আমাকে পাঞ্জাবি হতে হয়েছে। পাঞ্জাবি কথাবার্তা আমি বলতেও পারি বুঝতেও পারি। সেটাই আমার কোয়ালিফিকেশন অথবা এক্সপিরিয়েন্স

আমি ঠিক মিঞ্জর মেলার আগের দিন চম্বা পৌঁছব। পাঙ্গিদের সঞ্চয় করা চরস ওরা দু-একজনকে জমা দেয়, কিলো প্রতি দুহাজার টাকা পায়। আমি কিনি কিলো প্রতি দশ হাজার টাকা। আমার মালিক সেটা লাখটাকা কিলো হিসেবে কাকে দেয় আমার জানার দরকার নেই। লাভ না পেলে চলবে কি করে? প্রয়োজনের সময় কত টাকা ঢালতে হবে তার ঠিকানা নেই। আমার কাছে কুড়ি হাজার টাকা আছে দু কিলো কেনার জন্যে। টাকা অবশ্য অনেক বেশি এনেছি, দরকার মত খরচ করার ঢালাও পারমিশনও আছে। তবু আমি কৃষ্ণনগর কলেজের বি এ পাশ ছেলে, টাকার অভাব খুব ভাল করে বুঝি। আর বুঝি ঢালাও হাতে খরচ করলে লোকের চোখে পড়ে, লোকের সন্দেহ হয় এত টাকা খরচ করছে কি করে? সুতরাং আমি টিপে টিপে খরচ করতে অভ্যস্ত।

এবার আমি আগে আগে এসেছি একটা কারণে, সেটা হল মিনিকিয়ানি গ্লেসিয়ারের পথে সবচেয়ে শেষ গ্রাম দারকুণ্ডের একটা ঠিকানা পেয়েছি, সেখানে নাকি চরস পেতে পারি অনেক কম দামে। ওদের স্টকও অনেক বেশি আছে নাকি। খবরটা যখন আমি জানি তখন আমাদের এই লাইনে যারা কাজ করছে তারাও নিশ্চয় জেনেছে। হয়ত আমি প্রথম ব্যক্তি নই যে দারকুণ্ড যাচ্ছি। আমার আগে গিয়ে কেউ স্টক তুলে নিয়েছে। হতে পারে নয় সেটাই স্বাভাবিক। তখনই মনে হল শ্রীমতি মঞ্জরি বসাকের পেটে বাচ্চার বদলে আছে যে জিনিস তাকে আমাদের ভাষায় মাল বলতে পারি। কিংবা সাদা বাংলায় চরস। গাঁজার রস শুকিয়ে পাকানো মটরশুঁটি। গাঁজার কুঁড়ি বা ফুল শুকনো করে নিয়ে যাবার অনেক হাঙ্গামা। তার চড়া গন্ধ পাওয়া যায় বলে নিয়ে যাওয়া কঠিন। তবে দাম পাওয়া যায় অতিরিক্ত বেশি। কানপুরে এক কিলো শুকনো কুঁড়ির দাম চার লাখ টাকা। বেশিও হতে পারে।

সুতরাং মিস মঞ্জরি বসাক, আমার চোখে ধুলো দিতে পারনি তুমি। পুলিশের চোখকেও ধুলো দেওয়া তোমার পক্ষে খুব কঠিন। ওসব পোয়াতি টোয়াতি খুব সোজা বুদ্ধি। সহজেই চোখ আটকায়। অন্য কোনো প্ল্যান নিলে ভাল করতে। মঞ্জরী নামটাও নিশ্চয় আসল নয়। বেশ্যাদের মত ওটা তার বাজারের নাম। আসল নাম হয়ত নীলিমা কিংবা সুমিতা। নামে কি বা এসে যায়। নীলিমা হোক কিংবা সুমিতা, মহিলা হয়ত বাঙালিই নয়। আসাম কিংবা উড়িষ্যার হতে পারে। মরুকগে যাক, তাতে আমার কি? কলকাতা কিংবা শহরতলিতে অমন অনেক অন্য প্রদেশের লোক আছে যারা এত সুন্দর বাংলা বলে যে ধরা মুস্কিল। এতসব ভাবার দরকার নেই আমার কেন ধরে নিচ্ছি যে বাঙালি মেয়েরা চরস ক্যারিয়ারের মত রিস্কি কাজ করবে না, করতে সাহস পারবে না।

ঠিক মিলে গেল আমার অনুমান। দারকুণ্ডে এসে যোগাযোগ করতেই তারা বলল —এক বাঙালি ঔরত দো কিলো লে গয়ী পরশোঁ।

আমার ভাগ্যে মাত্র এক কিলো লেখা ছিল, তাই নিয়ে নিলাম। গ্রাম থেকে মাল পেলাম বলে দামে কম,

মালটাও ভাল কোয়ালিটির। ছোট ব্লাস্টিকের শিশিতে ফিনাইল নিয়ে এসেছি, সেটা বার করে মালের প্লাস্টিকের প্যাকেটের ওপর ফিনাইল লাগানো কাপড় জড়িয়ে রাখলাম পিঠটুর একদম নিচে একটা আলাদা পকেটের ভেতর যার কোন জীবন নেই আছে সূক্ষ্ম সেলাই, টপ করে দেখা যায় না। আমার বিশেষ রকমের পিঠটু বিশেষভাবে বানানো হয়েছে বিশেষ কাজের জন্যে। আর তার বিশেষ রকমের গোপন পকেটে মোল্ডেড ভিনাইলের লাইনিং করা। কেটে না ফেললে জানা কঠিন ভেতরে কি পদার্থ রয়েছে।

এমন কি আমি ফিরে যেতে পারি শ্রীমতি মঞ্জরী বসাকের মত। কিন্তু এবার আমার আরও একটা কাজ আছে। দারকুণ্ড যখন এসেছি এখানকার গাঁজার বনটা একবার দেখে যাব ভেবে রেখেছিলাম। আর একটা কথা মনে এসেছে। চম্বা দিয়ে চরস পার হচ্ছে সেটা দিল্লির নারকোটিক্স সেল জেনেছে। আমাকে চম্বার বদলে অন্য রুট খুঁজতে হবে। আমার মালিক এই জন্যেই আমাকে ভালবাসেন। আমি অন্যদের মত গোঁয়ার গোবিন্দ নই। আমি ইন্টেলিজেন্ট, আমি ভদ্রলোক, বিনীত স্বভাব এবং সাধারণ বাঙালির মত পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চির ছোটখাট মানুষ বলে কলেজের ছাত্র হিসেবে খুব সহজে চালিয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং সন্দেহ বশে আমাকে ধরে নিয়ে গেলেও আমি খুব বিনীত ভাবে বলতে পারি—

—আমি কানপুরে এমবিএ পড়ি স্যার, এই দেখুন আই কার্ড। ট্রেকিং করতে এসেছিলাম এদিকে, কে জানত এমন বিপদ হবে। মাত্র তিনশ টাকা আছে, হোস্টেলে ফিরব কেমন করে তাই ভাবছি। আমার টিকিট রয়েছে দলের লিডারের সঙ্গে। প্লীজ ছেড়ে দিন আমাকে। ওসব চরস টরস আমি দেখিনি কোনদিন।

একবারই এমন অবস্থা হয়েছিল। তখন খুব মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলেছিলাম কথাগুলো। অফিসার বললেন

—কলেজের ছেলে, চরস খাওনি হতেই পারে না।

—আজ্ঞে চরস কেন আমি কোনদিন এ্যালকোহল পর্যন্ত খাইনি। বিয়ার চোখে দেখিনি। গরিব ঘরের ছেলে স্যার, পড়াশুনা করে চাকরি করতে হবে আমাকে। অনাথ বালক ছিলাম, একজন মানুষ করেছেন আমাকে। নারকোটিকস ড্রাগস আমার জন্যে নয় স্যার।

আমার পাঞ্জাবি হিন্দি মেশানো কথা আর চেহারা এবং মাঝে মধ্যে দুটো চারটে ইংরিজির ফোড়ন মন্ত্রের মত কাজ করেছিল। অফিসার মান সিং ধিন্ডা নামের কলেজের আই কার্ড দেখে বলেছিলেন

—যাও, কিন্তু খুব সাবধান, কারো কোনো প্যাকেট নেবে না। হাতে ধরিয়ে দিলেও নেবে না। ফেলে দেবে। বুঝেছ?

সেই প্রথম, সেই শেষ। তারপর আর কোনোদিন বিপদ হয়নি। লেখাপড়া শেখা লোক এই লাইনে নেই বললেই হয়। সেটাই আমার এ্যাড্‌ভান্টেজ। এইসব শুনে সেবার মালিক বলেছিলেন—

—ঠান্ডা মাথা রাখা এই লাইনে খুব দরকার। খুব কঠিন সময়েও মাথা ঠাণ্ডা রাখলে তবে কাজ ভাল হয়। দেখেছ তো, আমাদের বুদ্ধিটা কেমন কাজে লাগল।

তা ঠিক। ছিলাম বাঙালি, সাজলাম পাঞ্জাবি, ছিলাম ছাত্র, হলাম ক্যারিয়ার, বুদ্ধি আছে বইকি?

দারকুণ্ডে মাত্র সাতটা গৃহস্থ থাকে। তারা শীতের সময় নেমে যায় নিচের দিকে। এই জায়গাটা, এর পাশের নদী, পাহাড়, গাঁজার বন সব ঢেকে যায় বরফে। জায়গাটা খুব সন্দর, ভার্জিন তরাই অঞ্চল। এখানে যুগ যুগ ধরে ঋষি মুনিরা তপস্যা করে এসেছেন। আর আমি এসেছি বাণিজ্য করতে। আমাকে গাঁজার বন দেখাল একজন। এখন ফুল ফোটার সময় নয়। আরো একমাস পরে ফুটবে। নদীর ওপারে অনেকটা জায়গা বেশ ভ্যালির মত। সেখানে ঝিরিঝিরি পাতাওলা গাঁজার গাছ হাওয়ায় দুলছে। যেমন ফসল ফলবে এবার, ফুল ফুটবে, শুঁটি ধরবে। কলকল করে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বয়ে চলা নদীর ধারে গাঁজার ক্ষেত প্রকৃতির নিজের হাতে তৈরি করে, কাউকে চাষ করতে হয় না। গ্রামের লোক জোয়ান থেকে বুড়ো সবাই এসে পাতা চটকে বের করে রস, তা থেকে গুলি পাকিয়ে শুকিয়ে রাখে। ফুলের কুঁড়ি তুলে শুকিয়ে রাখে। এটা ওদের সারা বছরের রোজগার। বরফ পড়লে তখন তো কোনো চাষবাস করা যাবে না। তখন টাকাই ভরসা। বললাম—

—আমার আর এক কিলো চাই, বেশি টাকা দিতে রাজি আছি। পাঁচ হাজার টাকা দেব, আছে কারো ঘরে?

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল লোকটা। গুলি পেলাম না কিন্তু গত বছরের শুকনো ফুল মেশানো কুঁড়ি পেয়ে গেলাম। এর গন্ধ খুব কড়া, নিয়ে যাওয়া খুব রিস্কি ব্যাপার। তবে একবার নিয়ে যেতে পারলে এ বছর আর বাণিজ্যতে বের হতে হবে না। আমি আর চম্বা ফিরব না ভাবছি। অন্য রাস্তা যদি পেয়ে যাই সেদিক থেকে চলে যাব ধর্মশালা। কিন্তু ধর্মশালার বিপদ বেশি। ওদিক দিয়ে বেশি মাল পার হয়। গাঁজার ফিল্ডও অনেক বড় বড় রয়েছে ওদিকে। আমার সঙ্গে লোকটি বলল—

—চম্বা রুট আচ্ছা রহেগাঁ, মেলা কে টাইম হ্যায়, বহুত লোগ জমেগা। সবকে সাথ নিখল যানা সাব। কোই দিক্কত নেহী হোগা।

।। দুই।।

লোকটা পাঞ্জাবি নয়, হতে পারে না। বাঙালি, অসমিয়া নিদেনপক্ষে ওড়িষ্যার হতে পারে। মোটকথা উনি

যে পাঞ্জাবি নন সেটা ধরা খুব কঠিন নয়। মান সিং ধিন্ডা কিছুতেই নয়। ওসব আমার অনেক দেখা আছে। পাঞ্জাবিরা অন্য রকমের হয়। তারা বেজায় বাস্তববাদী। তারা ওর মতন অমন করে কথাই বলবে না। কেমন এগিয়ে এসে বলল— আপ একেলি আয়ি হ্যাঁয়? আমি একলা এসেছি তো তোমার বাবার কি? তারপর মেরা নাম মান সিং ধিন্ডা, যেচে নাম বলবে পাঞ্জাবির বাচ্চা? তবে লোকটা ভাল, মনটাও ভাল। একজন মহিলা, যিনি অন্তঃসত্ত্বা, তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়ার সাহস সবার থাকে না। অন্তঃকরণ ভাল না হলে টেরিয়ে দেখে চলে যাবে নিজের রাস্তায়। পাহাড়ে যারা আসে এ লোকটা তাদের একজন, ট্রেকার এ নয়। এর চোখের চাউনি বলে দিচ্ছে এ ট্রেকার নয়। বুদ্ধিমান মানুষের চোখ দেখলে চেনা যায়।

তবে যদি ও ঝানু লোক হয় তাহলে ওর থেকে বিপদের সম্ভাবনা নেই। বলা আছে রাভি ভিউ হোটেলে দেখা করতে। মনে হয় আসবে না। ও যদি আসে তাহলে বুঝতে হবে লোকটার বদ উদ্দেশ্য নেই। আর যদি ও আসল লোক হয় তো আসবেই। রতনে রতন চেনে ভালুকে চেনে শাঁখ আলু। আমি যদি ভালুক হই তাহলে শাঁখ আলু ঠিক চিনেছি, খুঁড়ে বার করে নেব। আর ও যদি ভালুক হয় তাহলে ও ঠিক শাঁখ আলু চিনে নেবে। দু-কিলো সাইজের পেট চেনা এমন একটা মুস্কিলের ব্যাপার নয়। তবে এটা খুব পুরোনো চাল হয়ে গেছে, গ্রামের দিকেই চলে। পাহাড়ে মানুষেরা বেশ সরল প্রকৃতির হয়। তাদের কাছে এসব ভাঁওতা বেশ চলে। কিন্তু একটা ছ সাত মাসের পোয়াতি মেয়ে পাহাড়ে মজা করতে এসেছে, এটা কি বিশ্বাস করার মত কথা হল?

প্রথমে যেতে হবে একটা অন্য হোটেলে, সেখান এক রাত্রি থেকে বাস স্ট্যান্ডে যেন বাস ধরতে এসেছি এমন ভাব করে পেটের বাঁধন খুলে নিতে হবে। বাসে ট্রেনে আর পাঞ্জাবের গরমে পেটে দুকিলো মাল বেঁধে রাখার যে কী যন্ত্রণা সেটা কে বুঝবে? ছাল ছামড়া উঠে যাবার মত অবস্থা হবে ঘষা খেতে খেতে।

লোকটা বলল ও দিল্লি যাবে, কিন্তু ও দিল্লি যেতেই পারে না। সবার কারবার দিল্লি থেকে উঠে গেছে, ওখানে বেজায় রিস্ক। তার চেয়ে উত্তর প্রদেশ ভাল, পুলিশে ঘুষ নেই, কোনরকম গোলমাল করে না। লোকটা হয় আলিগড়, আরা কিংবা কানপুর যাবে। কানপুরে যাওয়াই সম্ভব। দু বছর ধরে ওটাই বিজনেস সেন্টার হয়ে রয়েছে। ওখান থেকে বেনারসে মাল সাপ্লাই হয়, আর বেনারস থেকে ছড়িয়ে যায় দিকে দিকে।

চম্বা থেকে প্রথমে মিস্টার এন্ড মিসেস মান সিং ধিন্ডার নামে দুটো এসি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটতে হবে পাঠানকোট টু লখনৌ। তার সঙ্গে নতুন হোটেল উঠে সাদি কা জুড়া একসেট কিনতে হবে মেলা থেকে। যাদের একমাসও হয়নি বিয়ে হয়েছে সে বউটি জুড়া পরে ঘোরে। দুহাতে রঙিন চুড়ি হাত ভর্তি। আগে পেছনে সোনার চুড়ি, কানে গলায় সোনার গয়না, ঠোঁটে লিপস্টিক। একটু বেশি সাজগোজ একটু চড়া মেকআপ। সঙ্গেই আছে গয়না, সস্তার জিনিস মেকি মাল। বর বউ হয়ে যাওয়া সবচেয়ে ভাল ছদ্মবেশ। ওপন এন্ড ক্লোজ। সবার সামনে ঘুরব কিন্তু কেউ সন্দেহ করবে না। গাযে গা দিয়ে থাকলেই হল, আর রাতে একঘরে থাকা? তা সে তো কত ব্যাপারই হল জীবনে, ও আর এমন কি? তবে সমস্ত জিনিসটাই অনুমানের ওপর নির্ভর করে নেওয়া হচ্ছে। অলকা এসব অনুমান অভ্রান্ত ভাবে করতে পারে, নাহলে বৃথাই এ লাইনে আসা। আছে, ধরে নেবার মত চোখ থাকলে ধরা সোজা। অলকার বিয়ের সোনালি চটি নেই, উপস্থিত পাহাড়ে পরার জুতো ব্যাগে রেখে পুরোনো চটিতে কাজ চালাতে হবে। তাহলে জুড়ার সঙ্গে একজোড়া চটিও চাই। ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ। আর মান সিং, তার নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে, তার পোষাক? ও কে, তার জন্যে একটা নতুন টি শার্ট কিনতে হবে। কেনা কাটা কালই করে রাখতে হবে। পরের দিনটা খালি রাখা উচিত। হাওয়ার গতি বুঝে নেওয়া দরকার।

যদি মান সিং কানপুরে না যায় তো কোথা যেতে পারে। আলিগড়, আগ্রা কিংবা বেনারস? বেনারস নয় কেননা ওটা হল সেল সেন্টার। ওখান থেকে যতদূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। আলিগড় হবে না, বড় ট্রেন থামে না। এলাহাবাদ হতে পারে। কানপুরের আর এলাহাবাদের মধ্যে ভাগ করলে কানপুর হবে এইট্টি, এলাহাবাদ হবে টুয়েন্টি। চম্বার রেলের টিকিট কাউন্টারে ভিড় হবে মেলার জন্যে, এজেন্টকে দিয়ে তৎকাল টিকিট কাটাতে হবে। চম্বা থেকে ভোর ভোর ট্যাক্সি, সোজা পাঠানকোট স্টেশন, সেখান থেকে ট্রেনে। হানিমুন করতে যাওয়া কাপলকে বিরক্ত করবে কার দায় পড়েছে? কাল বিকেল থেকে নো মোর পোয়াতি ছদ্মবেশ।

এ দিন কয়েকের মধ্যে চম্বার চেহারা পাল্টে গেছে। ইরাবতী নদীর ওপারটা ছোটখাট মাঠ যাকে এদিককার লোক বলে চৌগন, সেটাতে নানা রকমের দোকান পসার বসতে শুরু করেছে। নাগরদোলা, কাঠের ঘোড়ার চরকি বসেছে। আর মাত্র তিনদিন আছে মঞ্জরী বসাক নামটা ভালই কয়েন করা হয়েছে। তবে মান সিং কি জানে আমি মঞ্জরী নই। কেননা নামটা শুনেই ওর মুখের চেহারা অন্য রকম লেগেছিল। মিঞ্জর মেলায় বরুণ দেবতার নামে উৎসর্গ করা মোষ ভাসিয়ে দেওয়া হবে রাভি নদির জলে, তখন উৎকট জোরে বাজনা বাজবে, প্রচুর লোক হল্লা করবে আর বরুণ দেবতার নামে জয়ধ্বনি করবে। তখন, ঠিক তখনই অলকা ওকে বলবে, আমি চিনেছি তোমাকে হে মান সিং, তুমি পাঞ্জাবি নও, তুমি বাঙালি। এমন সত্যি করে বলো তো তোমার নাম এবং ঠিকানা। আমি তোমার প্রতি কিছুটা হলেও আকর্ষণ বোধ করছি। এখন তোমার কথা শুনি। এই হট্টগোলের মধ্যে বল দেখি ঈশ্বর কেমন আমাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন। তুমি কি ভগবান মানো? আমি মানি, আর মানি বলেই বলেছিলাম, তাঁকে, একবার যেন শেষ ট্রিপ হয়। আমার এই জীবন আর ভাল লাগছে না। এই উঞ্ছবৃত্তির এবার শেষ করে দাও প্রভু।

একমন একজনকে এনে দাও যার ওপর ভরসা করে সব বলতে পারি। কাউকে এনে দাও হে আমার ভাগ্য বিধাতা। এই জীবনের ভার কতদিন সহ্য করতে হবে?

চামুণ্ডা হোটেলটা সবচেয়ে কাছে সরু গলির ভেতর। কিন্তু সব ঘর বুক করা আছে, কাল থেকে লোক এসে যাবে। অন্তঃসত্ত্বা বলে কথা, কেবল একরাত্রির জন্যে দিতে রাজি হল একটা ঘর। আমার তো তাই চাই, তবু ভান করতে হল বেজায় অসুবিধে হয়ে গেল আমার। রাজি হলাম, বললাম যদি অন্য হোটেল পাই তো কাল সকালে ছেড়ে দেব। আমি জানি রাভি ভিউ আমার কাল থেকে বুকিং করা আছে, এ্যাড্‌ভান্স দেওয়া আছে। যাবার সময় করে গেছি। কিন্তু তার আগে আমাকে এই পেট থেকে নিষ্কৃতি পেতে হবে। আসার সময় রাভি ভিউতে ওরা আমার পেট দেখেনি। রাত্তিরটা আমি এখানে কাটিয়ে সকালে চলে যাব বাস স্ট্যান্ডে। সেখানে লেডিস টয়লেটে ঢুকে পেট খালি করে বেরিয়ে আসব। কাজটা সাবধানে করতে হবে যেন কেউ সন্দেহ না করে, বিশেষ করে কুলিগুলো।

কতদিন পরে ভাল করে চান করলাম। এখানে আমি নাম লিখেছি মিসেস মঞ্জরী বসাক, আমার আই কার্ডে ওই নামটাই আছে। বলেছি মেলায় ফটোগ্রাফি করতে এসেছি, দুতিন দিন থাকব। ওরা একদিনের জন্য ঘর দিয়েছে। অতি খারাপ হোটেল এটা মাত্র তিনশ টাকা রোজ ভাড়া। আমি দেড়হাজার দু হাজার দিতে অভ্যস্ত। এসি নেই, অবশ্য এখন দরকারও নেই। তাছাড়া এই সব ছোটখাট হোটেল, গলির ভেতর। হয় গা ঢাকা দেবার জন্যে।

ঘরের মধ্যে ডাল রুটি তরকারি আর দই খেয়ে, ছিটকিনি লাগিয়ে পেটের বাঁধন খুললাম। যদি রাতে রেড হয়, যদি কেউ সন্দেহ করে পুলিশ কে বলে দিয়ে থাকে আমার গতিবিধি, তাহলে ধরা পড়ে যাব। সুতরাং আমাদের নিয়ম মত সাবধান থাকতে হবে সব সময়। সব সময় মানে সব সময়। টয়লেটের কলটা বন্ধ করে দিলাম টাইট করে, এখন আর জল আসবে না ওর ভেতর। ফ্লাসটা চালিয়ে দিয়ে জল বের করে দিলাম। এবার ফ্ল্যাসের ওপরের ঢাকা খুলে ভেতরে যেটুকু জল ছিল সব তোয়ালে দিয়ে শুকিয়ে নিলাম। তার মধ্যে সাবধানে মাল রেখে চাপ দিলাম শুকনো একটা ছেলেদের জামা। এই পুরোনো ছেলেদের জামা একটা আমি রাখি এই রকম প্রয়োজনের জন্যে। আমি সহজেই বলতে পারি ওটা অন্য কেউ রেখে গেছে। জামাটা আমার নয় কোন পুরুষের। ঢাকনা লাগিয়ে দিলাম ভাল করে। এখন আমি নিশ্চিন্ত। এখন কেউ দরজা খুলতে বললে আমি একটা চাদর জড়িয়ে দরজা খুলব, লোক এলে আমার কাছে কিছু পাবে না, কেবল সামনে একটা দামি ক্যামেরা ঝুলছে দেখতে পাবে।

ঠিক তাই হল, রাতের ডিউটিতে এসে হোটেলের রিসেপ্‌শনের লোকটি দেখতে এল কে কোন ঘরে আছে। বাইরে থেকে যখন বেল বাজাল, তখন রাত দশটাও হয়নি। আমি মেয়েছেলে, একা রয়েছি, মতলবটা কি জানতে আসতেই পারে। বললাম—

—কৌন হ্যায়?

—হাম হোটেল স্টাফ ম্যাডাম, কোই ডর নেহি। দরওয়াজা খোলিয়ে।

—ম্যায় একেলি হুঁ, কেয়া চাহিয়ে?

—আপ ঠিক হ্যায় না? কোই তক্‌লিফ তো নেহি হ্যায়।

—থ্যাঙ্কস, কোই তক্‌লিফ নেহি। কাল সুবহ চলি যাউঙ্গি।

—ওকে, গুড নাইট ম্যাডাম।

—গুড নাইট।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। হোটেল রেজিস্টারে নাম ঠিকানা ফোন নম্বর সব দেওয়া আছে। কি জন্যে এসেছি তাও লেখা আছে, ফটোগ্রাফি। সুতরাং পুলিশ এলেও আমার ঘরে রেড করতে আসবে না। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। এলেও কিছু খুঁজে পাবে না। এবার আমি ঘুমোতে পারি।

সকাল সাতটা হয়নি তখনো, প্রস্তুত হয়ে নেমে এলাম। পেমেন্ট করাই ছিল। কাউন্টারে চাবি দিলাম। এখন আমার পেটটা বেশ দর্শনীয় ভাবে প্রকট। বললাম—

—চলে যাচ্ছি, শরীর ঠিক লাগছে না। কিছু কিছু ফোটো তুলেছি, দেখা যাক। এখন বাস পেয়ে যাব নিশ্চয়।

—জী মেমসাব, আধা ঘন্টা বাদ মে বাস মিলেগা পাঠানকোট কা। আপকা ব্যাগ বাসস্ট্যান্ড তক লে জানেকে লিয়ে বোল দেতা হুঁ। আপ চলিয়ে।

এগোলাম আমি। ব্যাগ নিয়ে হোটেলের লোক আসবে বাস পর্যন্ত। ততক্ষণ পর্যন্ত আরাম। ততক্ষণ পর্যন্ত মেয়েদের টয়লেটটা দেখে নিতে পারব। তিন চাকার স্কুটার রিক্সা আছে স্ট্যান্ডে। একটা নিয়ে বাজারে চলে যাব, দোকান টোকান দেখে প্রথমে ব্রেকফাস্ট, তারপর জুড়া আর চটি কেনা, তারপর ওর জন্যে টি শার্ট।

আবার বাস স্ট্যান্ড, আবার টয়লেট এবার সদ্য বিবাহিতার মত বেশ করে সোজা হোটেল রাভি ভিউ। তবে ভারমোর থেকে একটা বাস পৌঁছনোর জন্যে অপেক্ষা করতে হল, যেন এই মাত্র ভারমোর থেকে এলাম। ভারমোর না হয়ে ডালহৌসি হলেও আপত্তি নেই।

আমার প্রোগ্রাম একেবারে ফুলপ্রুফ। সব ঠিক ঠিক মিলে গেল, কেবল হোটেল রিসেপ্‌শনে বলল—

—আপনার রুমটা সিঙ্গল বেড, দুজনের শোবার অসুবিধে হবে। ডাবল অকুপেন্সির জন্যে এক্সট্রা টাকা লাগবে।

—ঠিক আছে দেব। ওতেই দুজন কষ্ট মষ্ট করে কাটিয়ে দেব। দুটো মাত্র দিন। এখন মেলার ভিড়ের সময়, আর কোথা জায়গা পাব বলুন? আমার হাজব্যান্ড আজ আসবেন কথা আছে, এলে সোজা রুমে পাঠাবেন। আশা ছিল রাখ থেকে উনিও ভারমোরের এই বাসটাই ধরবেন। হয়ত পারেননি, পরের বাসে আসবেন মনে হয়।

এই হোটেলটা ভাল। ঘরে এসি আছে। প্রথমেই ব্যাগ থেকে মালের প্যাকেটগুলো বার করে বাথরুমে চালান করলাম। এখন তো আর ফ্ল্যাশের ভেতর রাখা যাবে না। ওটার দরকার হবে। তবে এই বাথরুমের সিঙ্কটা বেশ উঁচুতে, তার পেছনে দেওয়ালের দিকে জায়গা আছে। দরজা বন্ধ করে চেয়ার এনে তুলে দিলাম মাল। নিচ থেকে কোন রকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। ওখানে দুলাখ টাকার মাল রাখা রইল, একবার কানপুর পৌঁছে দিতে পারলেই আমার দায়িত্ব শেষ। এখন ঘর ছেড়ে বের হওয়া খুব রিস্ক। পায়ে সোনালি স্যান্ডাল, হাত ভর্তি জুড়া, ঠোঁটে লিপ্‌স্টিক, গায়ে মোটামুটি হাল্কা গয়না পরে নিয়েছি। এরকম করে রাস্তায় বের হওয়া হাজব্যান্ড ছাড়া মানায় না। এখানে আমার রুম বুক করা হয়েছে আমার নিজের চলিত নাম মঞ্জরী বসাক নামে। আর লোকটা এসে রিশেপ্‌সনে ওই নামটাই বলবে। কিন্তু সে তো জানে না আমি তার বউ হয়ে গেছি এখন। এখন আমি মিসেস মান সিং ধিন্ডা।

ফোন তুলে জিজ্ঞেস করলাম পরের বাস ভারমোর থেকে ক'টার সময় আসে। ওরা বলল এই মাত্র বাস এল ম্যাডাম। আমি তাড়াতাড়ি করে নেমে এলাম রিশেপ্‌সনে। যদি এসে যায়। কি অভ্রান্ত আমার হিসাব, আসছে লোকটা, আসছে, এদিকেই দেখছে। আমি এগিয়ে গিয়ে সবার সামনে হাত ধরলাম ওর।

।। তিন।।

মেয়েদের ভগবান অভিনয় করার ভাল ক্ষমতা দিয়েছেন আত্মরক্ষার তাগিদে। এখন ওর আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আগে দরকার অভিনয়। তুমি আমার বর, আমি বউ, এবং এটা উভয়ের রক্ষাকবচ। হাত ধরে মঞ্জরী বলল—

—এখন আমি মিসেস সিং ধিন্ডা, হোটেলে একটা রুম আছে আমাদের। ইফ আই এমন নট রং দারকুন্ডে কিছু কিনতে গিয়েছিলে। এস, দুজনে মিলে আলোচনা করব। তারপর পাঠানকোট থেকে কানপুর যাবার ট্রেনের টিকিট কাটতে দেব, এসি ফার্স্ট ক্লাস তৎকাল টিকিট পাব মনে হয় কালকের কিংবা পরশুর। এস আমার সঙ্গে।

কতদিন ধরে এমন একটা মজার ব্যাপার ঘটেনি চিত্তরঞ্জনের জীবনে। তবে ঘটনার ফেরে দুজনেই চিনতে পেরেছে দুজনকে। বলল

—মাল কোথায় রেখেছেন?

—রাথরুমের সিঙ্কের ওপর। নিচ থেকে দেখা যাবে না।

—কি করে জানেন আমি কানপুর যাব?

কানপুর শব্দটা অনেকের কানে যেতে পারে। এখন ওরা রিসেপ্‌শনে এসেছে। এখন লিডারশিপ মঞ্জরীর হাতে। জিজ্ঞেস করল কাউন্টারে।

—আপলোগোঁকা কোই ট্রাভেল এজেন্ট হ্যায়?

—হ্যা জি।

—বুলা দেঙ্গে? হামারা কুছ কাম হ্যায়।

—জরুর।

—থ্যাঙ্কস্

এখন ওপরে চল আমার ঘরে। ওখানে কথা বলব। এখন থেকে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট আমার হাতে থাক। হানিমুন করতে আর ফটো তুলতে এসেছি আমরা চম্বায়। আমি মঞ্জরী আর তুমি মান সিং ধিন্ডা। লাভ ম্যারেজ রেজিস্ট্রি হয়েছে দশদিন আগে। আমাদের পরিচয়গুলো সেরে রাখতে হবে, ডিটেল করে রাখতে হবে প্রতিটি মুভ।

ঘরে বসে ওরা নানা আলোচনা করতে লাগল, কেন সোজা কানপুর যাওয়া ঠিক নয়, লখনৌ থেকে বাসে যাবে, ট্যাক্সিতে নয়। বাস হল অপেক্ষাকৃত সেফ, আর এসি ফার্স্ট ক্লাস নয় এসি টু টায়ার বা থ্রি টায়ার বেস্ট। এখন এরা প্রবল রিস্কের মাঝে দুজন রয়েছে বলে হোটেল থেকে বেশি বের হওয়া উচিত নয়। হানিমুন কাপল্ বেশি বাইরে যায় না, একান্ত বা নিভৃত জায়গা খোঁজে সব সময়। আর তারা সব সময় হাসি হাসি মুখ করে থাকে। নতুন জামা কাপড় পরে, সেজেগুজে থাকতে চায়। আর কি কি চায় সেটা ভেবে দেখতে হবে। নতুন টি শার্ট কেনা ঠিক হয়েছে, নতুন প্যান্ট একটা মান সিং এনেছে, তার সঙ্গে একটা টাই। তবে নতুন একটা শার্ট কিনতে পারলে ভাল হত। মঞ্জরী বলল—

—মনে কর পাঠানকোটে আমাদের ধরল পুলিশে। তখন আমাদের এ্যাক্‌শন কি রকম হবে?

—তুমি কেঁদে ভাসাবে। পারবে তো? ফোন করবে সেল ফোন থেকে বাবাকে। কাঁদতে কাঁদতে বলবে কি বিপদে পড়ে গেছ চম্বায় হানিমুনে এসে। আমি বলব, ভয় কোরো না, আমরা যখন ইনোসেন্ট কিছু হবে না। পুলিশ সন্দেহ করেছে, লেট দেম ডু দেয়ার জব।

—আমাকে কথা বলতে দেবে। তুমি কেবল কেঁদে ভাসাবে। ব্যাস সেটাই হবে একটি অতি সাধারণ হানিমুন কাপলের রি-এ্যাক্শন বুঝেছ?

—একা একা ভাল লাগে না জানো চিত্ত, আমি আমার ঠাকুরকে বলছিলাম এই একটু আগে, এবার আমাকে মিলিয়ে দাও এমন একজনকে যাকে আমি সব বলতে পারি, বিশ্বাস করতে পারি। দেখ তোমাকে পেলাম আজকেই। আমি মঞ্জরী নই, অলকা, মিসেস অলকা পাত্র, বাগনানে থাকতাম, বর তাড়িয়ে দিল চরিত্র ভাল নয় বলে। মা বাবা বলল বেরো এখান থেকে। সাত ঘাটের জল খেয়ে খেয়ে ঘেন্না ধরে গেছে আমার। এবার তুমি যা বলবে তাই হবে।

চিত্তরঞ্জনের মুখের হাসিটা বলছিল এই অষ্টম ঘাটটার জল খেয়ে দেখ যদি তোমার পছন্দ হয়। আমিও তো তোমার মতই ভাল কিংবা মন্দ কোন কিছুই নই, মাঝের একজন হয়ে রয়েছি। একার বদলে দোকা হয়ে এবার দেখাই যাক।